Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ : বিজ্ঞান থেকে দর্শনে

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.11
Pages	199-213
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ : বিজ্ঞান থেকে দর্শনে

Check for updates

মুনিরা সুলতানা*

বৈজ্ঞানিক দুরূহ তত্ত্ব অবলম্বন করে রচিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধগুলো বিষয়ভাবনার গুণে তাঁর কালে হয়েছিল অভিনব। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম* বইটি সম্পাদনা প্রসঙ্গে ত্রিবেদী যদিও বলেছিলেন —

> বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী হয় নাই। বিজ্ঞানের বাঙ্গালা এখনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাষার অভাবে এখনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে কেহ সাহস করে না। লিখিলেই রচনা অপাঠ্য অবোধ্য হইয়া উঠে।[১]

কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি এবং প্রকাশের সাফল্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন এসব প্রবন্ধ ঘিরেই। জ্ঞান-পিপাসাকে অনিবার্য করে বিজ্ঞান-অনুরাগ সৃষ্টি এবং তা থেকে দর্শনভাবনায় স্থিত হতে চেয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। অনুসন্ধিৎসু সত্তার বড়ো যে গুণ, সেই জিজ্ঞাসাবোধকে তিনি বহন করেছেন সারাজীবন। আর তার মীমাংসাসূত্র আবিষ্কারেই দর্শনে তাঁর আগ্রহ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন এবং বিজ্ঞানের সমন্বয় তিনি করতে চেয়েছেন সচেতন নৈপুণ্যে। বলা হয়, "রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিকের মতো চিন্তা করেছেন, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাকে বিন্যাস করেছেন এবং শেষে সাহিত্যিকের বোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।"[২] তিনি নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং সে কারণে তাঁর বিজ্ঞান-পরিশীলিত নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারমুক্ত শিক্ষা ও বুদ্ধির দ্বারা প্রাকৃত জগতের নিগূঢ় মর্মরহস্য-সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং তথ্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩]

ত্রিবেদীর অধিকাংশ বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে প্রধানত দুটি বিষয়ের যোগ ছিল — প্রাণতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই দুই বিষয়ের গবেষণা অবস্থা সেকালে কীরূপ ছিল, সে-সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের অভিব্যক্তি কীভাবে ঘটে, সে-বিষয়ে চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী গবেষণাগ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পিসিজ' (*Origin of species*) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে, ত্রিবেদীর জন্মেরও (১৮৬৪) বছর পাঁচেক আগে। তারপরে বারো-চৌদ্দ বছর ধরে সেই তত্ত্ব ক্রমশ পরিমার্জিত হয় এবং বিশেষজ্ঞমহলে স্বীকৃতিও পায়। সাধারণভাবে বিবর্তন বলতে বোঝায় অনবরত ছোট ছোট বদলের মধ্য দিয়ে জীবের দীর্ঘ ক্রমবিকাশ। ডারউইন বিবর্তনের সপক্ষে বিপুল সাক্ষ্য উপস্থিত করেন। বিবর্তনের বাস্তব পন্থা হিসেবে তিনি দাঁড় করান 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে। তিনি বলেন, আকস্মিক বদলের ফলে একাধিক জাতিরূপ (genotype) পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কিছু জাতক থাকবে যাদের শরীরে বদল হয়েছে, আবার অনেক জাতক থাকতে পারে যাদের কোনো বদল হয়নি। এদের মধ্যে যারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরও সহজে মানিয়ে নিতে পারবে তারা বেঁচে থাকবে এবং দ্রুত

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বংশবৃদ্ধি করতে পারবে। অন্যেরা সেই অনুপাতে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারবে না এবং শেষ পর্যন্ত লোপ পাবে। একেই ডারউইন বলেছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। আধুনিক প্রাণতত্ত্বের এটা একেবারে শুরুর কথা। বস্তুত খাদ্যের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা এবং জন্মহারের অতিবৃদ্ধি পর্যায়ে ম্যালথাস সে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছিলেন, তা ছিল শুধু মানব বংশ-সম্পর্কিত। ডারউইন সে তত্ত্বকেই জীবজগৎ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। বিষয়টি পরবর্তীকালে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অর্থাৎ যেকোনো ভাবেই হোক না কেন সমকালীন চিন্তায় এর প্রভাব বহুমাত্রিক। এ সম্পর্কে বারট্রান্ড রাসেল বলেন—

> Evolutionism, in one form or another, is the prevailing creed of our time. It dominates our politice, our literature and not least our philosophy.[৪]

সমাজ কিংবা জীববিদ্যাসহ অন্যান্য অনেক বিদ্যাই যে ডারউইনের তত্ত্বের কাছেই ঋণী সেকথা রাসেলের মতো ত্রিবেদীও অনুভব করেছেন।[৫]

এবার জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা প্রসঙ্গ। আঠারো শতকে উইলিয়াম হার্শেল (William Herschel) নক্ষত্র-বিশ্বের একটি চিত্র তৈরির চেষ্টা করেন যা টেলিস্কোপ আবিষ্কারের ফলে সম্ভব হয়েছিল। এর কিছুকাল আগেই জোহান ল্যামবার্ট (১৭২৮-৭৭), থমাস রাইট (১৭১১-৮৬) এবং ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) মিল্কি ওয়েকে (আমাদের ছায়াপথ) নক্ষত্রপুঞ্জ-সংবলিত একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে অনুমান করেছিলেন। উনিশ শতকের অল্প আগে থেকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই সৌরজগত, ছায়াপথ ও নীহারিকার (celestial and terrestrial bodies) গঠন-সম্পর্কিত ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৬] মহাকর্ষ বল বিষয়ে নিউটনীয় চিন্তা এবং আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' (১৯১৬) জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাকে এগিয়ে দেয় বহুদূর। ১৯৪০-এ রাডার প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলে 'রেডিও অ্যাস্ট্রনমি' একটি সক্রিয় ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮-এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি-সম্পর্কিত 'বিগ ব্যাং থিয়োরি' পূর্ণতা পায়। এরপর 'ফিজিক্যাল কসমোলজি'-বিষয়ক জ্ঞান একালে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, শক্তিশালী টেলিস্কোপের ক্রমাগত উন্নতি অধুনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যায়।

নবজাগরণের কারণেই হোক বা পরিবেশগত অন্য কারণে — উনিশ শতকের বাংলায় 'আধুনিকতার' ভাবাদর্শের একটা বড়ো অঙ্গ ছিল বিজ্ঞান। সমাজসচেতনতা যেমন আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, বিজ্ঞানও করেছে অনেকটা। বরং এটাই লক্ষ করা যায় যে, সেকালে বিজ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞান বিষয়ে ভাবনার প্রধানতম বাহন ছিল সাহিত্য। উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক শিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষা বলতে প্রধানত সাহিত্যাশ্রয়ী শিক্ষাকেই বোঝাত, যার আধুনিক নাম মানবিক বিদ্যা (Humanities)। সুতরাং বিজ্ঞানের ভাবাদর্শও আশ্রয় করেছিল সাহিত্যকে। সেকালের অনেক প্রজ্ঞাবানের মনেই বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট চেতনা ছিল। এঁদের মধ্যে বেশ কজন ছিলেন প্রথম সারির সাহিত্যিক। যেমন — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনার মতো বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাও অনেকটা শিক্ষামূলক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য বিজ্ঞানকে বৃহত্তর সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবেই দেখেছিলেন। তাঁর *বিজ্ঞান-রহস্য* বইয়ের অধিকাংশ লেখা প্রথমে 'বঙ্গদর্শন'-এ বেরিয়েছিল। এঁরা ছাড়া আরো অনেকে বিজ্ঞানকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করতে এগিয়ে এসেছিলেন।[৭] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুবছর আগে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর *বিশ্ব পরিচয়*। তাঁর বেশ কিছু কবিতায়ও বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। এদেশের চিন্তাবিদদের প্রেরণা হিসেবে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কাজ করে থাকতে পারে। *বিজ্ঞান-রহস্য* বইয়ের প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> এই সকল প্রবন্ধ প্রধানত হকস্লী, টিন্ডল, প্রক্টর, লাকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে।

১৮৭৬-এর মধ্যে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯১৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ যা সায়েন্স কলেজ নামে পরিচিত। একই বছর স্যার জগদীশচন্দ্র বসু উদ্বোধন করেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'।[৮] এছাড়া ভারতীয় ঐতিহ্যে বিজ্ঞানচর্চার একটা তাগিদ তো ছিলই। বরাহমিহির (৫০৫ খ্রি. পূ., *পঞ্চসিদ্ধান্ত* গ্রন্থ রচয়িতা), আর্যভট্ট (৫ম-৬ষ্ঠ শতক), প্রভাকর (৬ষ্ঠ শতক) ভাস্করাচার্য্য (৬ষ্ঠ-৭ম শতক), দেবাচার্য্য, ব্রাহ্মগুপ্ত (৬ষ্ঠ-৭ম শতক) প্রমুখ প্রাচীন জ্যোতির্বিদ পৃথিবীর পরিধি, সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন, বিশেষত পৃথিবীর দৈনিক/আহ্নিক গতি-সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন মীমাংসা করে এ উপমহাদেশের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণার সূচনা করেছিলেন, যখন গ্যালিলিও বা নিউটনের আবির্ভাব ঘটেনি। আর্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের সে অবদানের কথা রামেন্দ্রসুন্দর *প্রকৃতি* গ্রন্থের 'প্রাচীন জ্যোতিষ' প্রবন্ধে স্মরণ করেছেন। এছাড়া উপনিষদ-অনুপ্রাণিত হিন্দুর জীব ও জগৎ এবং ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রচার প্রচেষ্টা হয়ত 'আলোকিত' সময়পর্বে বিজ্ঞান-বোধকে অসহযোগিতা করেনি। কারণ, উপনিষদ মতে — 'ব্রহ্ম হলেন এমনই এক চৈতন্যের আলোক' যাঁর ফলে এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। ইন্দ্রিয়-মাধ্যমে বিচিত্র জগতের যে পরিচিতি, তা ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, সে জ্ঞান তাঁকে জানারই জ্ঞান।[৯]

দুই

জীবন ও সত্য সম্পর্কে একটা অখণ্ডতার উপলব্ধি এবং বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞের সাথে একে মিলিয়ে নেওয়াই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-দর্শনবোধের মূলসূত্র। বিশ্বপ্রকৃতি এবং এর পেছনে ক্রিয়াশীল কার্যকারণ তথা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে (আইনস্টাইনের ভাষায় 'natural harmony')[১০] তিনি কেবল বর্ণনাই করেননি; সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের এক প্রত্যয়কে উপলব্ধি করে জাগিয়ে তুলেছেন এক ধরনের দার্শনিক বিপ্রশ্নিকা, যে বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের সাথে প্যারিসে দেখা হয়েছিল 'Creative Evolution'-এর রচয়িতা আঁরি বাঁর্গসঁ-এর। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন, "পাশ্চাত্যরা বড় precise। তবে ভারতীয় মনের মতো অন্তর্দৃষ্টি তাদের নেই।"[১১] মানুষের জ্ঞানের সীমানা ও জ্ঞানচর্চার উন্নতিকে অভিবাদন জানান রামেন্দ্রসুন্দর। এ প্রসঙ্গে

প্রাবন্ধিকের বিজ্ঞানচর্চা বা পঠিত জ্ঞানের পরিধিও কিছুটা বোঝা যায়; 'জ্ঞানের সীমানা' প্রবন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নানামাত্রিক অবদান স্বীকার করে তিনি বলেন —

> নিউটনের কল্যাণে জগতে স্থিতির ও গতির ব্যবস্থা জানিয়াছি, হর্শেল হইতে আকৃতি ও আয়তন জানিবার চেষ্টা হইয়াছে ; কিকর্ফের সময় হইতে গঠন ও উপকরণ ক্রমেই বিবৃত হইতেছে ; এখন জগতের জীবনের ইতিহাস লইয়া কথা। কেল্‌বিনের ধীশক্তি পৃথিবীর ও সূর্য্যমণ্ডলের বয়স নিরূপণে প্রযুক্ত হইয়াছে। ... লকিয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বয়স অনুসারে তারকাগণের শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। লাপ্লাসের পন্থানুবর্ত্তী হইয়া হেলমহোলৎজ সৌরজগতের ভ্রূণদশা হইতে আনুক্রমিক অঙ্গবিকাশ এবং শক্তিসঞ্চার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
> ... ক্লার্ক মাক্সওয়েলের ধীশক্তি আলোক, তড়িৎ ও চুম্বকশক্তির সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে। অধ্যাপক হার্টজ ঈথরমধ্যে ক্রোশদীর্ঘ দৃষ্টির অগোচর আলোক-উর্ম্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রতিভার সমরক্ষেত্রে বিজয়নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন।[১২]

বিজ্ঞানকে একটি মানসিক প্রবণতারূপে গ্রহণ করা এবং জ্ঞান আহরণ করে 'সমগ্র চিন্তা প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সঙ্গত করে তোলার'[১৩] একটি ব্রত যেন ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের। বিজ্ঞানকে যেটুকু তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্রে, সেটুকু গণিত বা রসায়ন শাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যা নয়। মূলত তিনি জীববিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মানবজীবনের নানা সত্য-সন্ধানে মনঃসংযোগ করেন। তবে বিজ্ঞানের সত্য সম্পর্কে কেবল একটি জায়গায় তাঁর আপত্তি। আর তা হলো — বিজ্ঞানের সত্য নিরপেক্ষ সত্য, ধ্রুব নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজকে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বা তথ্যকে কাল ভিন্ন সত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু তবু বিশ্বজগতের বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনার প্রেরণা-উৎস সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি —

> আমি এইক্ষণে আমার সম্মুখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ একটা মহাব্যাপার দেখিতে পাইতেছি। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত কি কারণে জানিনা, ইহার পরিসর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, ইহার পরিধি ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। ইহার পরিসরের সীমা কোথায়, তাহা নির্ধারণ করিতে পারিনা; ইহার জটিলতার অন্ত কোথায়, তাহাও নিরূপিত হয়না। তথাপি এই দুর্ভেদ্য জটিলতার গ্রন্থি কতক উন্মোচন করিয়া শৃঙ্খলের পরম্পরাসূত্র কতক আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা চলে না। তাই যেরূপে হউক, একটা শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিতে অন্তরিন্দ্রিয় স্বতই ধায়। এই শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নিমিত্ত, এই গ্রন্থির উন্মোচনের নিমিত্ত, মনুষ্যজাতির অবলম্বিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির নাম বৈজ্ঞানিক রীতি।[১৪]

এছাড়া বিশ্বজগতের অধিকাংশই মানবের অজ্ঞাত ও অপরিচিত এটা ভেবেও যতটুকু দেখা যায়, তার অন্তরালে কী আছে জানার জন্যও মানুষ আকুল থাকে। তাই "ক্রমাগত সেই অন্তরালের অভ্যন্তরে প্রবেশ" করার চেষ্টা এবং এক রহস্য ভেদ করার পর তার গভীরে প্রচ্ছন্ন আরো গূঢ়তর রহস্যের আবরণ উন্মোচন করার ইচ্ছা জ্ঞানতৃষ্ণারই[১৫] এক রূপ বলে মনে হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের।

নিয়মনিষ্ঠ ব্যবহারিক সত্য-অবলম্বী বিজ্ঞানজগতের (cosmic process) ব্যাখ্যার পাশাপাশি বিজ্ঞানের শেষে দার্শনিকতার শুরুকে এবং 'pragmatic truth' থেকে 'absolute truth'-এ যাওয়ার এক প্রাচ্য সাধনা ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের। তাঁর সারস্বত

সাধনার যাত্রাপথ এবং যাত্রার প্রাক্-অন্তিম স্তর হাক্সলি বা স্পেন্সারের বিজ্ঞানদৃষ্টির আলোয় আলোকিত। ডারউইন-হাক্সলি-ওয়াল্স-স্পেন্সারের রচনাসমূহ পড়ে প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের অভিজ্ঞান অনুযায়ী জীবনের মৌল জিজ্ঞাসাগুলোকে তিনি পরখ করে নিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম সংকলনগ্রন্থ *প্রকৃতি*। 'বিচিত্র জগৎ', 'ভূবিদ্যা', 'জ্যোতির্বিদ্যা', 'প্রাচীন জ্যোতিষ', 'মৃত্যু' প্রভৃতি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবিষয়ক চৌদ্দটি প্রবন্ধ এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়া *বিচিত্র জগৎ* ও *জগৎ কথা* এ দুটো গ্রন্থও ত্রিবেদীর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। *প্রকৃতি* গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো মুখ্যত চার্লস রবার্ট ডারউইন, টমাস হেনরি, হাক্সলি, উইলিয়াম কিংডন, ক্লিফোর্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতবাদ এবং তাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য অবলম্বনে লেখা। বার্গসেঁর 'Creative Evolution' তত্ত্বের পেছনে আছে 'elan-vital' (vital Impulse) বা প্রাণপ্রবাহ যা গতিশীল বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নব নব সৃষ্টি সাধন করে চলেছে। এই অবিরাম বিবর্তন-প্রবর্তনা বার্গসেঁর ভাষায় রূপ পেয়েছে এভাবে — "to exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly".[১৬] 'vital Impulse'-এর তাড়নায় প্রাণীর এই অগ্রগতির মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও লক্ষ করেন 'প্রাণের উচ্ছ্বাস' এবং বলেন, "প্রাণ চলিতেছে, কেবল একমুখে ঊর্ধ্বমুখে চলিতেছে; চলিবার কালে আপনাকে ফুটাইতেছে, প্রকাশ করিতেছে, বিকাশ করিতেছে ...এই সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্ত নাই — ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই —" ।[১৭] ভারতীয় আর্যভাষায় 'জগৎ' (√গম্ + ক্বিপ) শব্দের অর্থই হলো যা গমন করছে অর্থাৎ যা গতিশীল। ভারতীয় আর্যচেতনায় এই জগৎ বা বিশ্ব সর্বদাই গতিময়, জঙ্গম। আর পাশ্চাত্য 'গতিবাদ' তথা গতিচেতনার সাথে প্রাচ্য উপনিষদীয় গতিবাদের প্রতিতুলনায় মূল পার্থক্য স্পষ্ট হয় এই প্রবাহের (Eternal Flux) পরিণতির প্রশ্নে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন ভাবনায় বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ-রূপান্তর (becoming) হলো পরবর্তী স্তরকে অভিব্যক্ত করার জন্যই। কিন্তু প্রাচ্য গতি-দর্শনের অনুভবে রয়েছে এক কেন্দ্রীয় স্থির পরম সত্য, এক অদ্বৈত সত্তা।[১৮] আশ্চর্য এই গতিশীলতায় সৃজনশীল প্রাণের চলার লক্ষ্য, উদ্দেশ্যকে রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করলেও মূলত "প্রাণের গতির স্বাধীনতা"কে পর্যবেক্ষণ ও স্পষ্ট করেছেন। প্রকৃতি জগতের জীবনক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্ক তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, সেখানেও রয়েছে এক ধরনের গতির সৃজন-আবেগ অনুভব —

> ...বহিঃপ্রকৃতি হইতে জীবকোষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই জীবকোষের জীবনের উদ্দেশ্য; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জড়শক্তিনিচয়ের তদনুযায়ী সামঞ্জস্যপ্রয়াসই জীবন, সেই সামঞ্জস্যনাশই মৃত্যু; জীবকোষের সমবেত জীবনই জীবের জীবন, জীবনরক্ষার প্রয়াসে শরীরমধ্যে অঙ্গবিভাগ ও অবয়ববিভাগ, জীবনরক্ষার প্রয়াসেই আত্মপুষ্টি, আত্মপুষ্টিরই পরিণতিক্রমে বা প্রকারভেদে বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদন; ব্যক্তিগত জীবনরক্ষার প্রয়াসফলেই জাতিভেদ ও শ্রেণিভেদ ও বর্ণভেদের উদ্ভব; জীবনরক্ষার উপযোগিতায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও অনুপযোগিতায় অপকর্ষ ; জীবনযুদ্ধে বিজয়চেষ্টার ফলে জাতিগত অভিব্যক্তি।[১৯]

'প্রাণের কাহিনী', 'চঞ্চল জগৎ', 'প্রাণময় জগৎ' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রাণের বিকাশ-গতির কিংবা বৈশিষ্ট্যের নানা বর্ণনা রয়েছে। যেমন —

> জড়-বিদ্যার attitude স্বতন্ত্র।... প্রাণ আপনাকে রাখিতে চায়, আপনাকে বাড়াইতে চায়, আপনাকে বিচিত্র করিতে চায়। ইহাই প্রাণের কামনা, এই কামনায় প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ।... প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে বাড়াইতেছে, আর অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অজস্রতার ইয়ত্তা নাই, — ইহা অতি বিপুল ব্যাপার।[২০]
>
> প্রাণ যেমন জড়কে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, জড়ও তেমনই অবিরাম প্রাণি পদার্থকে জড় পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা যুদ্ধ চলিতেছে। ... প্রাণের যেন একটা সঙ্কল্প আছে, একটা will আছে। ইহা তাহার will to live; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। কোন-না-কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ... জড়ের অবিরাম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাণ আজ পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই; প্রত্যুত আপনাকে সর্ব্বত্র বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।[২১]

ত্রিবেদীর এসব আলোচনা প্রাণের গতি বা বিকাশ-সম্পর্কিত। তবে প্রাণবিজ্ঞানের জড়বাদী বা যন্ত্রবাদী (mechanist) এবং প্রাণবাদীদের (vitalist) দ্বন্দ্ব নিয়েও তিনি ভেবেছেন। বার্গসঁ-এর সময়ে ডারউইন ও স্পেন্সারীয় যান্ত্রিকতাবাদ ছিল অত্যন্ত জোরালো। এছাড়া হেগেলোত্তর কালের হেগেলীয় বামপন্থি জড়বাদী দার্শনিকগণ বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।[২২] হেনরি বার্গসঁ সব ধরনের জড়বাদ ও যান্ত্রিকতাবাদ-বিরোধী লেখনী ধারণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণবাদীদের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীদের বিরোধকে mechanist বনাম vitalist- এর মতান্তর বলেছেন। তবে তিনি নিজে vital force-এর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। সে-দ্বন্দ্ব তাঁরও ছিল, সে-সূত্রেই বলেন —

> গণ্ডগোল হয় এই vital force নামটা লইয়া। এক পক্ষ প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এই vital forceএর অবতারণা করেন; বলেন যে, mechanical, physical বা chemical forces প্রাণের স্বরূপ নির্ণয়ে কুলাইবে না। ... প্রকৃত পক্ষে vital force নামটার উপর এরূপ চটিবার সম্যক্ হেতু দেখি না। জড় জগতের mechanical description দেওয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার চরম লক্ষ্য বটে। গ্যালিলিও, নিউটন এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরা এই পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বিদ্যা জড় জগতের যাবতীয় ঘটনাকে mechanical formula-য় ফেলিতে পারেন নাই। যখনই দরকার হইয়াছে, তখনই নূতন নূতন non-mechanical concept গড়িয়া নূতন নূতন force-এর আশ্রয় লইয়াছেন। electric force, magnetic force, chemical force ইত্যাদি নূতন নূতন non-mechanical conceptএ আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ প্রাণের তথ্য বুঝাইতে গিয়া যদি একটা নূতন conceptএর আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার vital force-ই নাম দেওয়া যায়, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার চটিবার কোন কারণ নাই।[২৩]

তবে এখানেই তাঁর শেষ কথা নয়। 'vital force-ও যে একদিন mechanical formula-য় আবদ্ধ হবে এবং তখন প্রাণি-দেহরূপ জটিল যন্ত্রের যাবতীয় ঘটনা গণনাসাধ্য হবে' সে-প্রত্যাশা তিনি করেছেন।

'মৃত্যু' প্রবন্ধে বিবর্তনবাদের ইতিহাসকে তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন ত্রিবেদী। লামার্ক, ডারউইন থেকে শুরু করে বিবর্তনবাদের নানা পর্যায়ের বিকাশের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে এতে। জীবের বীজআত্মা যে অবিনাশশীল ; প্রাণধর্মের যে মৃত্যু নেই তা ব্যাখ্যা করেন তিনি —

> জীব নশ্বর, কি অনশ্বর, এই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যাহা দেখা গেল, তাহাতে বোধ হইতেছে, জীবের বীজদেহ অনশ্বর; জীবের আবরণদেহ নশ্বর। মৃত্যু বীজের ধর্ম্ম নহে; মৃত্যু আবরণশরীরের ধর্ম্ম।[২৪]

ভূ-পৃষ্ঠের কাঠিন্য কিংবা এর স্তর-কাঠামো নিয়েও প্রাঞ্জল প্রবন্ধ রচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। *প্রকৃতি* গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো 'পৃথিবীর বয়স'। এতে ভূ-স্তরে প্রোথিত জীবাশ্ম বা হাজার বছর ধরে অতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা শিলার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এভাবে —

> যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগর-গর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।[২৫]

উদ্ধৃতির বর্ণনাগুলো লক্ষণীয়। ভূ-বিদ্যাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক বর্ণনা হলেও তা মূলত সৃজনশীল প্রকাশে স্বচ্ছন্দ।

প্রাণের জগৎ থেকে ত্রিবেদী তাঁর মনোযোগ ফেরান অনন্ত মহাকাশের দিকে, যেখানে রয়েছে নিয়মের অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ, গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের কক্ষপথে আবর্তন প্রক্রিয়া, এদের পদার্থ-গঠন প্রভৃতি ব্যাপারের শিল্পনৈপুণ্য যেন তাঁকে উন্মুখ করে রাখে এর নিবিড় পর্যবেক্ষণে। ত্রিবেদীর জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত এসব প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এরূপ : 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'আকাশ তরঙ্গ', 'প্রাকৃত সৃষ্টি', 'প্রাচীন জ্যোতিষ', 'প্রাচীন জ্যোতিষ-দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'আলোকতত্ত্ব', 'প্রলয়' (*প্রকৃতি* গ্রন্থ), 'মাধ্যাকর্ষণ', 'পৃথিবী' (*জিজ্ঞাসা* গ্রন্থ)। *জিজ্ঞাসা* গ্রন্থের 'মাধ্যাকর্ষণ' এবং *জগৎ কথা* গ্রন্থের 'মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা' প্রভৃতি ছোট প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহসমূহের আবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল শক্তিকে কোপার্নিকাস, কেপলার, দেকার্তে, নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন। মাধ্যাকর্ষণের বশবর্তী হয়ে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, সূর্যমণ্ডল ও সৌরজগতে আবর্তন করে বটে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন হয় সে-প্রশ্ন প্রবন্ধে উত্থাপন করে তিনি বলেছেন —

> গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ; উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট ; সৌরজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থ মাত্রই গতিবিশিষ্ট। প্রাচীন কালে কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, এই সকল গতি অসংযত অনিয়ত বোধ হইত। কেপলারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।... কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, উপগ্রহগণ ও আপেল-ফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না।[২৬]

গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ আবর্তনেও রয়েছে নিয়ম —

> সূর্য্য হইতে মঙ্গল নিকটে, বৃহস্পতি দূরে; উভয়ই সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থল করিয়া ঘানিগাছের বলদের মত ঘুরিতেছে। মঙ্গলের ভ্রমণপথ ভিতরে, বৃহস্পতির ভ্রমণপথ বাহিরে। মঙ্গল সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণে সুর্য্যের চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; কিন্তু বাহিরে বৃহস্পতি থাকায় তাহারও দিকে মঙ্গলের টান আছে; তাই মঙ্গল ঠিক সেই বৃত্তাকার পথে চলিতে পারে না ; একটু বৃহস্পতির দিকে হেলিয়া চলে। ... নিউটন দেখাইলেন, সৌর জগতের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়মের রাজত্ব ; — একবার কবির ভাষার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক দ্রব্য অপর দ্রব্যের অভিমুখে চলিতে চাহিতেছে, ঐ নিয়মে।[২৭]

সুতরাং প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই, "সর্বত্রই নিয়মের বন্ধন; জগৎ নিয়মের রাজ্য।" আবার এই সূত্রেই ত্রিবেদীর অনুসন্ধান — জগতে অতিপ্রাকৃতের স্থান কোথায়, আদৌ অতিপ্রাকৃত বলে কিছু আছে কিনা। 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত' কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাঁর আস্থা নেই। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে 'মিরাক্‌ল' বা অতীন্দ্রিয় ঘটনা কিছু আছে বলে তিনি মানতেও নারাজ। বিজ্ঞাননিষ্ঠ মননে 'প্রাকৃত' এবং 'অতিপ্রাকৃতে'র প্রশ্নটি তিনি বিচার করেছেন এবং স্বাভাবিক কারণে কোনো সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেননি। তাছাড়া মিরাক্‌ল বা অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে অনর্থক কৌতূহলতীব্র অন্বেষায় প্রকৃতিরাজ্যের নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলার জ্ঞানকে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত হয়ে "অসম্বদ্ধ ও অসংযত" হয়ে পড়াকেও তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে — "নিম্ন পর্যায়ের জীবে মানুষের মত জগৎকে সুনিয়ত দেখে না। মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্যায়ের জীব, মানুষ জীবন-সংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত সুনিয়ত দেখে, সে তত জীবন-সংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত।"[২৮] 'সৃষ্টি' প্রবন্ধে যদিও জগৎ সৃষ্টিতত্ত্বের নানা ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন কিংবা মুসলিম সুফিদের সৃষ্টিতত্ত্বে 'আকস্মিক সৃষ্টিবাদ' (theory of special creation)-এর ব্যাখ্যা রয়েছে, সৃষ্টি-সম্পর্কিত এটা সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন মত। ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মমতেও এ ধারণার সমর্থন রয়েছে। যেমন — স্রষ্টার ইচ্ছা থেকেই যে বিশ্বসৃষ্টি, এ কাহিনী বিবৃত বাইবেলের আদিপর্বে। রামেন্দ্রসুন্দর সকল সৃষ্টিতত্ত্বের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরে সৃষ্টি বলতে তিনি কী বোঝেন তা বলেছেন। চৈতন্য বা চিৎ-সত্তাকে এক্ষেত্রে মূল বলে স্বীকার করেছেন তিনি। সাংখ্যদর্শনে 'জ্ঞাতা পুরুষ' থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞেয় প্রকৃতির যে অস্তিত্ব রয়েছে এবং পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর সম্পর্কে ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তির যে ব্যাখ্যা আছে ত্রিবেদী তা উল্লেখ করেন এবং সে দর্শনকে অনেকটাই সমর্থন করে বলেন —

> আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। ... আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি, বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে।[২৯]

প্রকৃতিতে বা বহির্জগতে নিয়মের শৃঙ্খলার জন্যেও দায়ী যেন এই চৈতন্য; চৈতন্যকে সে নিয়মের সাথে সম্পর্কিত করে তিনি বলেন —

> জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার কল্পিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের ভরসা। ... নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আর চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; সেই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব।[৩০]

কিন্তু বিজ্ঞানের যে নিয়ম তা থেকে কীভাবে দর্শনের প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয় তার একটি দিক মেলে *বিচিত্র জগৎ*-এর অন্তর্গত 'ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ' প্রবন্ধে। বিজ্ঞানের জগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলাসংবলিত ব্যবহারিক জগৎকেই অবলম্বন করে। কিন্তু দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা বা কথিত নিয়তিকে কতখানি স্বীকার করা যাবে তা নিয়ে। ত্রিবেদীর ভাষায় —

> এই যে determinism, এই যে causal connection, এই যে নিয়তি, ইহা অবশ্যম্ভাবী necessary বটে কিনা, ইহা দর্শন শাস্ত্রের একট তুমুল সমস্যা। Hume-এর সময় হইতে অথবা তাহারও পূর্ব হইতে আজি পর্যন্ত ইহার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে।

তবে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ যে 'ভিন্ন পর্যায়ের পদার্থ' — এ কথাটা জোরের সাথে বলার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রাথমিক বিতর্ক-দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব বলে রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন।

তিন

রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিকচিন্তার সূত্রপাত বিজ্ঞানবিদ্যার বাহ্য বা ব্যবহারিক জগৎ থেকে। এ জগৎই তাঁর জ্ঞান-পিপাসাকে তীব্রতর করেছে, জগতের রূপ ও রহস্যের আদি কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর নানা প্রবন্ধে সে-দার্শনিক মতবাদগুলোকে সংকলন করে জগতের 'চিরন্তন সমস্যাগুলোকে'[৩১] উপস্থাপন করেছেন। যেমন — সুখ-দুঃখ, স্বার্থ-পরার্থ, ধর্ম-বৈরাগ্য-মুক্তি, কল্যাণ ও এরকম নানা বিষয়ক প্রশ্ন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকাশে স্পষ্ট হয়, বিজ্ঞানজগৎ স্বতন্ত্র কিছু নয়। জগৎ-ই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই জগৎ। যেমন — উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞান (Biology), মানুষ ও তার দেহবিজ্ঞান (physiology), মহাকাশ সৃষ্টি-বিষয়ক বিজ্ঞান (physical cosmology)। এভাবে অস্তিত্ব (জড় কিংবা জীব) মাত্রই বিজ্ঞান। আর একদিকে অস্তিত্বশীল থাকে মানবের চৈতন্য এবং সে চৈতন্য জগৎ থেকে যা আহরণ করে কিংবা ধারণ করে তা। এ নিয়ে তর্ক অনেক, যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার প্রসঙ্গও বিস্তর কিন্তু জগৎ সত্য একথা মান্য। চৈতন্যে জন্ম নেওয়া বা রূপান্তরিত দার্শনিক অন্বেষাগুলোর মাঝে আত্তীকৃত হয়ে থাকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থাৎ পুরো সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং সে কাঠামোর মাঝে অবস্থিত কিংবা ক্রিয়াশীল চৈতন্য এবং বিজড়িত থাকে এর বিকাশ, সংবেদনা, নির্মাণ, ধ্বংস কিংবা পুনর্জন্ম। এই চৈতন্য জ্ঞানকেই সমর্থন করে। আত্মধর্মে যুক্তিসিদ্ধ আস্থা আনার জন্যেই হোক বা অন্য কারণে — রামেন্দ্রসুন্দর জগতের অস্তিত্ব থেকে চৈতন্যের অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এর পেছনে ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের (বিশেষত সাংখ্যদর্শন) অথবা ভাববাদী বেদান্তদর্শনের চিন্তানিষ্ঠ অধ্যয়ন কাজ করেছে হয়ত। বিজ্ঞান দেশ-কাল-জড় পদার্থ ও শক্তি নিয়ে কাজ করে যা এককথায় ব্যবহারিক জগৎ; যার সত্যও ব্যবহারিক (pragmatic)। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ এবং এ দুই জগতের সম্পর্ক নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বলা যায়, তাঁর দর্শনবোধের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এ

বিষয়টি। বিশেষত — 'বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ', 'ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ', 'বাঙ্ময় জগৎ', 'চঞ্চল জগৎ' (*বিচিত্র জগৎ* গ্রন্থ), 'মায়াপুরী' 'জগতের অস্তিত্ব' 'সত্য' (*জিজ্ঞাসা* গ্রন্থ) ইত্যাদি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। বাহ্য/জড় জগৎ বলতে তিনি বিজ্ঞানী Bain রচিত 'mental and moral science' গ্রন্থের obejective world বা external material world বোঝেন, যা মূলত physical science-এর আলোচনার বিষয়। আর এই objective material world বা বৈজ্ঞানিকের বর্ণিত বাহ্য জগতের সাথে কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের মিল হয় না বলে ত্রিবেদীর মতে তা 'বৈজ্ঞানিকের নিজের হাতে গড়া বা মন-গড়া কাল্পনিক জগৎ।' Uniformity of nature কিংবা বিজ্ঞানী আবিষ্কৃত laws of nature সেই physical science-এরই অংশ।

অন্যদিকে, প্রাতিভাসিক জগৎ হলো প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ জগৎ। এরও দুটো অংশ — একটি হলো নিজস্ব প্রত্যক্ষভিত্তিক, দ্বিতীয়টি সাধারণের প্রত্যক্ষকেন্দ্রিক। আর সমগ্র জগতের যে অংশ সকলের পক্ষে একরকম, যা কারুর নিজস্ব নয়, তা বাহ্যজগৎ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকের জগৎ। এ জগৎকে তিনি বাঙ্ময় জগৎ-ও বলেন। এ জগৎ নিয়েই বিজ্ঞান বিদ্যার কারবার এবং "intelligence-এর মাধ্যমে বিজ্ঞানী conception-এর জগৎকে perceptible object-এ পরিণত করেন।" রামেন্দ্রসুন্দর এই তিন জগতের অস্তিত্বই স্বীকার করেন বলেই তিনি প্রাচীন ভারতীয় একজীব ও বহুজীববাদীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিজেকে দুই দর্শন মতের সমর্থক হিসেবে জানান। এই সূত্রেই তিনি realism, perception, concept, intelligence প্রভৃতি শব্দের মীমাংসা খোঁজেন। এখন এই জগতের সাথে ব্যক্তির চৈতন্যের যোগ কী করে সম্ভব? অর্থাৎ বিজ্ঞানের সত্য যদি কেবল ব্যবহারিক সত্য হয় তাহলে শাশ্বত (absolute truth) সত্য কোথায়? এ জিজ্ঞাসা থেকে ত্রিবেদীর দর্শন চিন্তার শুরু। তখন এ সন্ধানের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল প্রতিটি মানুষের আপন সত্তার অস্তিত্ব, যে সত্তা বা ভিন্ন অর্থে চৈতন্য বাহ্যজগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে—

> বাহ্য জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত আমার জড়দেহে অবস্থিত মস্তিষ্ক নামক বস্তুর কল্পনা করি এবং কল্পিত বাহ্যজগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মস্তিষ্কে আন্দোলন কল্পনা করিয়া সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি।
> ...আমি চিন্তা করি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা করি, অতএব আমি আছি। ...এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিন্তা, আমার অনুভূতি, বাসনা ও কামনা ও তৃপ্তি প্রভৃতির সৃষ্টি। এক কথায় সবটাই আমার ভিতর; আমিই সব।... বাহ্যজগৎ চৈতন্যময়, আমিও চৈতন্যময়। তাই বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাত।[৩২]

রামেন্দ্রসুন্দর এরপর জগতের অস্তিত্ব ও চৈতন্যরূপী আমি (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের জ্ঞান সংবলিত সত্তা) বা 'আত্মা', 'অহম' সম্বন্ধীয় সাংখ্য-বেদ দর্শন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এবং 'অহম' বা 'আমি' সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর জিজ্ঞাসা ওখানেই শেষ নয় এবং তাতে জগতের অস্তিত্ববিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও অনুপস্থিত। দেহকে তিনি বিশ্বজগতের অন্তর্গত বলেছেন এবং দেহের সাথে বাহ্যজগতের অনুক্ষণ যে কারবার চলছে তাকে তিনি বলেছেন 'জীবন'।[৩৩]

ডারউইনকথিত প্রাকৃতিক নির্বাচনকে রামেন্দ্রসুন্দর বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কেবল জীবের উন্নতি ও অভিব্যক্তির জৈবিক ক্রিয়া নয়, যোগ্যতমের উদ্বর্তন জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে — সকল জায়গায়। অভিব্যক্তির সাথে সাথে সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল, নৈতিকতা-অন্যায়-হিত সকল কিছুরই মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ অভিব্যক্তির সাথে সাথে মানুষের চেতনাও সূক্ষ্মতর, ব্যাপকতর ও গভীরতর হতে থাকে।[৩৪] হারবার্ট স্পেন্সার প্রমুখ ডারউইনবাদীরা অভিব্যক্তিবাদকে কেবল জীববিজ্ঞানঘটিত একটি সত্যরূপেই দেখেননি। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ, বিজ্ঞান-সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের ক্ষেত্রেও সত্যটিকে প্রয়োগ করে এর ব্যাপকতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁদের প্রবর্তিত পথে বিচরণ করেছেন। জীবন রক্ষার তাগিদই যে সব, আর সে-তাগিদকে ঘিরেই যে মানব জীবনের প্রায় সকল কিছু আবর্তিত হয়, এই সরল কথাটা তিনি বলেন সহজ বৈজ্ঞানিক সত্যে —

> জগৎব্যাপারের আগাগোড়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখা যায়, এই স্থলেই তাহার মূল। এইখান হইতেই ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি।... প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি, এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, জীবনের এই উচ্ছ্বাস ও বিকাশ সেই সনাতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হইতেই উৎপন্ন। মৃত্যু ছাড়িয়া জীবন নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই, পাপ ছাড়িয়া পুণ্য নাই, জগতের এই সর্ব্বপ্রধান সত্য। জীবন রক্ষার জন্য জীবে জীবে দ্বন্দ্ব, নখানখি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তি; ফলে জীবমধ্যে অভিব্যক্তি, উচ্চের আবির্ভাব, নীচের তিরোভাব; দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভিব্যক্তি, বিকাশ, উন্নতি; সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নুতন আশা, নূতন অশান্তি, নূতন দ্বন্দ্ব। জীবমধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং জীবসমাজে মনুষ্যমধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা।[৩৫]

মানবীয় সুখ-দুঃখকে দার্শনিক পন্থায় বিচার করেননি ত্রিবেদী, তাঁর অন্বেষাকে কখনও কখনও তেমন মনে হলেও বিজ্ঞানবোধই সেখানে প্রবল — জীবন রক্ষাকেই তিনি "মানবরূপী জীবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম"[৩৬] বলেছেন, যার সঙ্গে সম্পর্কিত মানব জগতের সুখ কিংবা দুঃখ।

তবে সুখ-দুঃখ বিষয়ে সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখবাদ, অভিব্যক্তিবাদের অন্তর্নিহিত দুঃখবাদ এবং বেদান্ত দর্শনের আনন্দবাদ — প্রতিটি সম্পর্কে এবং প্রতিটির মধ্যেকার পার্থক্য বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন ত্রিবেদী। সুখ-দুঃখের মতো ইউটিলিটি বা হিতবাদের মূল উৎস তিনি সন্ধান করেন ডারউইনিজমে। *কর্ম্মকথা* গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ তিনি বলেন —

> পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন ... আধুনিক কালের হিতবাদী পণ্ডিতেরা যেরূপে উত্তর দেন, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। ডারউইনপন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে বোধ করি এইখানেই নিরস্ত হইতে হয়। আমি কেন পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগের প্রেরণার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের বীজের মধ্যে নিহিত আছে...

আর যে বিধানের বশবর্তী হয়ে জগৎযন্ত্র (cosmic process) চলছে, তাকে রামেন্দ্রসুন্দর টমাস হাক্সলির অনুসরণে বলেন unmoral, এর সাথে ধর্মাধর্মের সম্পর্ক নেই। কিন্তু উন্নত মানব সমাজে যে বিধান অর্থাৎ ethical process, ধর্মাধর্মের সম্পর্ক তার সাথেই। আর এই দুই বা সমগ্র জগতের (জড়-জীব ও মানব সমাজ) মধ্যে কার্যকর রয়েছে নিয়তি, ঋত বা নিয়মের এক পরম ঐক্য; রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় —

> সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাহার অধীন; জগতের কোন অঙ্গ, কোন প্রত্যঙ্গ তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চলিতে পারে না।[৩৭]

অন্বেষণের এই জায়গায় আবার রামেন্দ্রসুন্দর নিয়তিবাদী হয়ে পড়েন। এই নিয়তি অবশ্য 'নিয়মের' সমার্থক। তবে এটি তাঁর দার্শনিক চিন্তার সাময়িক প্রকাশ মাত্র, মুখ্য সত্য বলে তিনি একে জানেন নি।

জগৎকে বাদ দিয়ে নির্জীব দার্শনিক চিন্তায় তাঁর মন ছিল না বরং খাঁটি বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে জীবনের নানা বিষয়ে দার্শনিক জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন ও তার উত্তরের সন্ধান করেছেন। তিনি জগতমুখী এবং সংগ্রামশীল জীবনের বিরাট কর্ম-উৎসবের প্রতি আগ্রহী। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারটি সচেতনভাবে মনে রেখে প্রতিটি মানুষের নিজসৃষ্ট জগৎকে এই বিপুলা প্রকৃতির প্রতিনিয়ত সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞের সাথে মিলিয়ে নিতে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান তিনি। *কর্ম্মকথা* গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে তারই প্রকাশ। কর্মজগতে স্বার্থপরতার প্রশ্নে বন্ধন ও সংকীর্ণতা আছে বটে, কিন্তু সেই 'কর্মকে' রামেন্দ্রসুন্দর অস্বীকার করেননি। কর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও বলবার বস্তু প্রাথমিকভাবে ইউটিলিটারিয়ানদের মতো মনে হলেও সর্বাংশে তা নয়। জগৎ সৃষ্টির মূলে যে 'ত্যাগের' আভাস পাওয়া যায় উপনিষদীয় তত্ত্বে, পরোক্ষভাবে সেটি মানুষকেও কর্মপ্রবৃত্ত হতে শেখায়, তবে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, সে কর্ম হলো নিজের 'হিতসাধনের' মধ্য দিয়ে (মানবের survival তথা ডারউইনীয় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' অর্থে) সমাজ তথা বিশ্বপ্রকৃতির সংস্থিতিকে নিশ্চিত করা; যেমন করে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হয়েছে ছন্দোবদ্ধ, 'cosmic process'-এর যা মৌল প্রয়াস — সেই কর্মানুষ্ঠানের বার্তা মানুষকেও গ্রহণ করতে হবে এক উচ্চ নৈতিকতার বোধে। আর এই কর্ম জ্ঞানেরই কাছাকাছি। কর্ম থেকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পরিণতি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট দিক হয়ে আছে। রামেন্দ্রসুন্দর এভাবেই বিজ্ঞানের পথ বেয়ে আসেন দর্শনে। এ পর্যায়ে ত্রিবেদী সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায়ের উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে হয় "...কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।"[৩৮] শাস্ত্রব্যাখ্যায় ত্রিবেদী যেহেতু মরমিবাদ, বৈরাগ্য কিংবা পারলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেননি, সুতরাং তাঁর দর্শনচিন্তাকে শেষ পর্যন্ত ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। জীবনের বৈচিত্র্য ও বিরোধের "সামঞ্জস্য" প্রয়োজন; কর্মবাদের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 'যোগ্যতম' হবার যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে, ত্রিবেদীর মতে সে শিক্ষারই পূর্বাভাস রয়েছে বেদ-গীতায়। জীবনসংগ্রামী না হওয়া এবং সমাজের মঙ্গলের (গভীর অর্থে) জন্য কর্ম না করা সর্বোপরি বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থা-সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ না করাকে তিনি মনে করেছেন 'অধর্ম'।[৩৯]

সমকালীন সাংস্কৃতিক বিবর্তনে ভারতবর্ষীয় ধর্ম-দর্শনের ক্রমিবকাশ বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় নানা অনুসন্ধান এবং অভিব্যক্তি পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানচর্চা বা যুক্তিবাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম-সাধনা ভারতবর্ষের আধুনিকতার আন্দোলনকেই পরিপুষ্ট করেছিল বলে মনে করা হয়। কারণ 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' অর্থাৎ নিজবুদ্ধি ও স্বজ্ঞাকে (বিজ্ঞানচর্চা বা যুক্তিবাদের যা বিরোধী নয়) ব্রাহ্মধর্মের শেষ বলে তিনি জেনেছেন। তত্ত্ববোধিনীর পাঠশালায় বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন ছিল। যাকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলে প্রচার করা অক্ষয়কুমার দত্তেরও উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫১ ও ১৮৫৩ সালে অক্ষয়কুমারের প্রসিদ্ধ বই *বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* বের হয়। বইটি ১৮২৮ সালে প্রকাশিত স্কটিশ লেখক জর্জ কুম্ব-এর 'The constitution of man considered in Relation to External objects'-এর ভাবানুবাদ।[৪০] এতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ছিল। প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খলা-অনুপ্রাণিত মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিয়ম নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে বইটিতে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বুঝেছিলেন সমাজ, জাতি দেশ সকল উন্নতির মূলে মানব চরিত্রের বলিষ্ঠতা প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে পাশ্চাত্যের লৌকিক বিজ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তিধর্ম সব বিরোধ ত্যাগ করে একসাথে মিলিত হয়েছিল। যাবতীয় বহির্জ্ঞানের জন্য পাশ্চাত্যনির্ভর হতে আর অন্তর্বিজ্ঞানের জন্য বঙ্কিম নির্ভর করতে বলেছেন 'হিন্দুশাস্ত্রে — উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানত গীতায়।' মানব মনের মুক্তিই যে, 'enlightment' এই বোধ উনিশ শতকীয় ধর্ম-বিজ্ঞান-দর্শন-যুক্তিচর্চার প্রধান ভিত্ ছিল। সুতরাং উনিশ শতকের ধর্মানুশীলনের কাছে ফিরে যাওয়ার নানামাত্রিকতায় উত্তীর্ণ হওয়াটা শেষ পর্যন্ত যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান বিকাশেরই অনুকূলে কাজ করেছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরের নানা মননধর্মী রচনা থেকে এই বোধটা স্পষ্ট যে, আধুনিক জগৎকে বুঝতে হলে, তার মোকাবিলা করতে হলে, বিজ্ঞানকে বুঝতে হবে। বিজ্ঞান যে একালের সংস্কৃতির খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এটা তিনি বুঝেছিলেন দায়িত্ববোধের সাথে। আর বিজ্ঞানের কাছে আমাদের শুধু যুক্তিনিষ্ঠা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তির পাঠ নিলেই চলবে না, তার ভাষাও রপ্ত করতে হবে। কারণ তা না হলে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বোঝা যাবে না।

পুঁজিবাদী সমাজসভ্যতা যে 'সাংখ্যিক' কর্ম অনুশীলনের বিজ্ঞাপন দেয় ও চর্চা করায়, প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক যতগুলো 'ডিজিটকে' যতভাবে ধারণ করছে, পরিণতিতে 'ফিকশনধর্মী' চিন্তায় না গিয়েও বলা যায়, মনুষ্যযন্ত্রের এ এক ক্ষতিকর বিবর্তন। কেননা জ্ঞান-অন্বেষা সেখানে প্রায় পুরোপুরি অন্তর্হিত। সংখ্যা যেখানে মুখ্য, বিজ্ঞাপন যেখানে পরিচর্যার কৌশল, সেই বাণিজ্য পুঁজির সংঘাতময় 'মিথিক্যাল কুরুক্ষেত্রে' নিয়ত আমাদের বাস। বাঙালির জ্ঞানচর্চা, দর্শন-উপলব্ধি, সবই হতে পারত স্বতন্ত্র যাত্রাভিমুখী। পৃথিবীতে উদ্বর্তনের আজব পদ্ধতির প্রতিযোগিতায় পুঁজিদেবতার আনুগত্যে আমরাও হচ্ছি বিলীন; সৃষ্টির সকল মৌলিক ভিত্তিভূমি হতে চলেছে বন্ধ্যা। পৃথিবীকে আর তাকে ধারণ করা মহাবিশ্বকে সারাজীবনের দৃষ্টির অভ্যাসে 'পুরনো' করে না ফেলে গভীর অভিজ্ঞানে এক ভিন্নমাত্রিক 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনের' পথ নির্মাণের সময় হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর সেখানেই প্রাসঙ্গিক। মনোজাগতিক উপনিবেশের নব নব পদ্ধতিকে শনাক্ত করতে পারা ও তা প্রতিহত করবার মতো মনস্বী মনন সৃষ্টির প্রয়োজনেই বাঙালি-চর্চিত দর্শনচিন্তার অনুবর্তনের বিকল্প নেই।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্ত বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। লেখকের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে তাঁর বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বইটি সম্পাদনা করেন। দ্রষ্টব্য, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, প্র.সং জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৮৫

২. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'ভূমিকা', *রামেন্দ্র রচনা–সঞ্চয়ন*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৯

৩. ড. অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ২য় সং ১৪০৬, পৃ. ৭৯

৪. B. Russel, 'Our knowledge of the external world', উদ্ধৃত, মোঃ শওকত হোসেন, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৮, পৃ. ১২৩

৫. 'জ্ঞানের সীমানা' নামক প্রবন্ধে ত্রিবেদী বলেন, "সমাজ শরীরী পদার্থ, অগস্ট কোম্‌ত তাহা অস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন, হবার্ট স্পেনসার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া জীববিদ্যার উপর সমাজবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ সমাজবিদ্যা জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উভয় বিদ্যাই ডারউইনের প্রতিভার নিকট সমান ঋণী। যোগ্যতমের স্থিতি, অযোগ্যের বিনাশ, এই মূলসূত্র স্থাপন করিলেই জীববিদ্যার প্রধান কথা বলা হইল, সমাজবিদ্যারও মূলকথা ও প্রধান কথাও শেষ হইল। সুতরাং ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি যাহা কিছু সমাজবিদ্যার শাখাস্থানীয়, সকলেরই ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। 'প্রকৃতি', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, গ্রন্থমেলা, কলিকাতা-৭, প্র.প্র. ১৩৮৪, পৃ. ২২

৬. ১৯২৪-এ আধুনিক টেলিস্কোপ আবিষ্কর্তা এডউইন হাবল (Edwin Hubble) শনাক্ত করেন যে, মহাবিশ্বে একাধিক গ্যালাক্সি রয়েছে। (একাল পর্যন্ত অনুমিত হয়েছে যে এর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ কোটি)। দ্রষ্টব্য, Olaf Pederson, *Early Physics and Astronomy : A Historical introduction*, revised edition, Cambridge university press, 1993

৭. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের চেষ্টার ফলে এক পর্যায়ে বাংলাভাষার সাময়িক সাহিত্যে বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক সাহিত্যপত্রেই প্রতি সংখ্যায় এক বা একাধিক বিজ্ঞান-সংক্রান্ত রচনা থাকত। দ্রষ্টব্য : 'বিজ্ঞানচর্চা এবং সাময়িক পত্রে বৈজ্ঞানিক রচনা' *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, পূর্বোক্ত।

৮. ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার ইংরেজি নাম 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স।' এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মহেন্দ্রলাল সরকার। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা এবং শিক্ষাদান এ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন — জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দ্রষ্টব্য : শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, *কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র*, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬, পৃ. ১৭৮ ও ২৩২

৯. দ্রষ্টব্য, রাধাকৃষ্ণাণ, 'বেদান্ত-অদ্বৈতবাদ', *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, কলকাতা, পৃ.৩৩২-৩৪৭

১০. "If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it."
"The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science. Whoever does not know it and can no longer wonder, no longer marvel, is as good as dead, and his eyes are dimmed… I am satisfied with the mystery of

life's eternity and with knowledge, a sense of the marvelous structure of existence- as well as the humble attempt to understand even a tiny portion of the Reason that manifests itself in nature." The Merging of Spirit and Science, উৎস : www.space motion.com/Theology- Albert- Einstein.htm

১১. উদ্ধৃত, ক্ষিতিমোহন সেন, *বলাকা কাব্য পরিক্রমা*, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., ৫ম সং, কলকাতা, পৃ. ৭৫
১২. "জ্ঞানের সীমানা", 'প্রকৃতি', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত পৃ. ২০-২১
১৩. ভূমিকা, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, *রামেন্দ্র রচনা-সঞ্চয়ন*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলিকাতা, প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৩৪
১৪. "প্রাকৃত সৃষ্টি", 'প্রকৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
১৫. "পরমাণু", 'প্রকৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫
১৬. উদ্ধৃত, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
১৭. 'প্রাণের কাহিনী', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১
১৮. দ্রষ্টব্য, ৭ম উদ্বোধন, *ঈশোপনিষদ*
১৯. "জ্ঞানের সীমানা", পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
২০. "চঞ্চল জগৎ", 'বিচিত্র জগৎ', পূর্বোক্ত, পৃ.৪৫০
২১. "প্রাণময় জগৎ", 'বিচিত্র জগৎ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫
২২. *সমকালীন পশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
২৩. "প্রাণময় জগৎ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬
২৪. "মৃত্যু", 'প্রকৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
২৫. "পৃথিবীর বয়স", 'প্রকৃতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
২৬. "মাধ্যাকর্ষণ", 'জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫
২৭. "মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা", 'জগৎ কথা', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত পৃ. ১৭১
২৮. "অতিপ্রাকৃত-দ্বিতীয় প্রস্তাব", জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪,
২৯. "সৃষ্টি", 'জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ.৩৮-৩৯
৩০. পূর্বোক্ত
৩১. দ্রষ্টব্য : *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৩২. "জগতের অস্তিত্ব", 'জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ.১৯-২২
৩৩. "মায়াপুরী", 'জিজ্ঞাসা', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১
৩৪. দ্রষ্টব্য : "ধর্ম্ম প্রবৃত্তি", 'কর্ম্মকথা', *রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড), পূর্বোক্ত।
৩৫. "ধর্ম্ম প্রবৃত্তি", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩২
৩৬. পূর্বোক্ত
৩৭. "ধর্ম্মের জয়", 'কর্ম্মকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
৩৮. উদ্ধৃত, ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙলির দর্শন : প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৫ম সং, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১৭০
৩৯. দ্রষ্টব্য, "জ্ঞানের সীমানা", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪০. জর্জ কুম্ব-এর বইটি সতের শতকের ব্রিটেনে উদ্ভূত 'Deism' ভাবধারার বাহক। এ ভাবধারাকে 'Natural Religion' আখ্যা দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে, এ জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী এবং এই প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলার যৌক্তিক কারণসমূহের ভিত্তিতেই কেবল স্রষ্টার উপস্থিতি স্বীকার্য; কোনো প্রেরিত ধর্ম (Revealed Religion) কথিত ঈশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্ব গ্রাহ্য নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ শৃঙ্খলাভিত্তিক এ মতবাদ বিজ্ঞানকে অনস্বীকার্য রেখেই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর ভাবানুবাদের 'বিজ্ঞাপন' অংশেও সে নিয়ম-প্রণালীর কথা জোর দিয়ে বলেছেন।